গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৫ - ২১ জানুয়ারি ২০১৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান লেনিন স্মরণে

২২ এপ্রিল ১৮৭০ - ২১ জানুয়ারি ১৯২৪

"পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা, ভণ্ড সোস্যালিস্ট যাহারা শ্রেণিসংগ্রামের বদলে শ্রেণি-সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহারা এমনও কল্পনা করে, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর শান্তিপূর্ণভাবে স্বপ্নের মতোই ঘটিয়া যাইবে। শোষক শ্রেণির শাসনের উচ্ছেদের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটিবে, ইহারা এইরূপ কল্পনা করে না। ইহারা বরং কল্পনা করে যে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হইবে এই ভাবেই যে, উদ্দেশ্য-সচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠ শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিবে। রাষ্ট্র শ্রেণিসমূহের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এই ধারণা হইতেই পেটি বুর্জোয়াদের ঐ কল্পস্বর্গের উৎপত্তি। এই কল্পস্বর্গ রচনার ফলে মেহনতি শ্রেণিদের স্বার্থের প্রতি কার্যত বিশ্বাসঘাতকতাই করা হইয়াছে। ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালের ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও অন্যান্য দেশে বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় 'সোস্যালিস্ট'দের যোগদানে এই বেইমানির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।"

— লেনিন (রাষ্ট্র ও বিপ্লব)

শাসক দলের মদতে মেডিকেল পরীক্ষাতেও টোকাটুকি

প্রতিবাদে ডি এস ও-র ডাকে ছাত্ররা বিক্ষোভে

কলকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষকে ডেপুটেশন

শাসক দলের ছাত্রনেতা ও চিকিৎসক নেতাদের কুকীর্তির আরও একটি অনন্য নজির তৈরি হল কলকাতা মেডিকেল কলেজে এম বি বি এস পরীক্ষা চলাকালীন ছাত্রদের একাংশকে টুকলি সাপ্লাইয়ের ঘটনায়। এর প্রতিবাদে ৯ জানুয়ারি অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র পক্ষ থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি করা হয়।

৫ জানুয়ারি কলকাতা মেডিকেল কলেজে কে পি সি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের এম বি বি এস পরীক্ষা চলছিল। সে সময় তৃণমূল কংগ্রেসের চিকিৎসক নেতা, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এবং রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ নির্মল মাজির মদতে এস এস কে এম মেডিকেল কলেজের টি এম সি পি নেতা ও বহু অপরাধের পাণ্ডা শুভজিত দত্ত এবং সৌমাভ চ্যাটার্জি পরীক্ষার হলে

চারের পাতায় দেখুন

বিজ্ঞান কংগ্রেসকে সার্কাস বানিয়ে দিল সরকার

মত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের

আবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চকে হিন্দুত্ববাদের প্রচারক্ষেত্র করে তুলতে গিয়ে সারা বিশ্বের কাছে ভারতের মাথা হেঁট করে দিল বিজেপি-সংঘ পরিবারের নেতারা। কর্ণাটকের মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১০৩তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চে 'শিব'কে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ হিসাবে বন্দনা করে 'গবেষণাপত্র' পড়া হল। 'শঙ্খধ্বনি পাকাচুলকে কালো করে' বলে এই দাবির মাহাত্ম্য কীর্তনে মেতে উঠলেন এক সরকারি আমলা। এসব দেখে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে 'সার্কাস' বলে অভিহিত করলেন নোবেল জয়ী ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী বেঙ্কটরমণ রামাকৃষ্ণণ। বিজ্ঞানী বি জি সিদ্ধার্থের মতে এটা বিজ্ঞান কংগ্রেস নয়, 'কুম্ভ মেলা' অর্থাৎ ধর্মীয় মেলা। তাঁর মতে, কিছু কর্তাভজা আমলার পরস্পর পিঠ চাপড়ানোর জায়গা হয়েছে এই বিজ্ঞান কংগ্রেস। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী পিএম ভার্গব বিরক্তির সাথে বলেছেন, বিজ্ঞান কংগ্রেসের মান পুরোপুরি নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপুল অর্থের অপচয় ছাড়া এর আর কোনও কার্যকারিতা নেই। অবশ্য বিজেপি কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বসার পর থেকে এমন ঘটনা প্রথম ঘটল না এবং এবারের

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিজ্ঞানের নামে নানা আজগুবি তত্ত্বের অবতারণার প্রতিবাদে মহীশূরে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি উদ্যোগে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের বিক্ষোভ

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সমাবেশ কলকাতায়

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি স্থায়ী কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, বেতন বৃদ্ধি, পি এফ-ই এস আই-পেনশন-গ্র্যাচুইটি সহ ছয় দফা দাবিতে ৭ জানুয়ারি রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন। এদিন এসপ্ল্যানেডে পাঁচ হাজারেরও বেশি কর্মী ও সহায়িকার বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিনহা, সংগঠনের সভাপতি তথা এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড মাধবী পণ্ডিত, ইসমত আরা খাতুন, কৃষ্ণা প্রধান প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই প্রকল্পটিকে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বহীন করে দিচ্ছে। বাজেটে বরাদ্দ বিপুল কমানো হয়েছে, চার হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বহুজাতিক সংস্থা বেদান্ত গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আই সি ডি এস মিশনের নামে প্রকল্পটির পুরো বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। তাঁরা বলেন, ২০১১ সালের পর রাজ্য সরকার এক টাকাও সাম্মানিক বৃদ্ধি করেনি। অবসরপ্রাপ্তদের এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদানের বিষয়টিও কার্যকর করা হয়নি। দুই সরকারের ভূমিকায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা গভীর সংকটে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে ব্লকে ব্লকে সংগঠন বিস্তারের আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি সেগুলি নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

‘সার্কাস’ বললেন বিজ্ঞানীরা

একের পাতার পর

বিজ্ঞান কংগ্রেস যিনি উদ্বোধন করেছেন সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজত্বকালে এটা আশ্চর্য কোনও ব্যাপারও নয়।

প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করতে গিয়ে বারবার ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে বিজ্ঞান গবেষণাকে মেশানোর কথা বলেছেন। কোন ঐতিহ্য? কিছুদিন আগে মোদিজি একটি হাসপাতাল উদ্বোধন করতে গিয়ে গণেশের হাতির মাথাকে প্রাচীন ভারতে উন্নত প্লাস্টিক সার্জারির নিদর্শন বলে যে হাস্যকর দাবি করেছিলেন, বা বিজেপি-সংঘ পরিবারের তত্ত্বাবধানে গুজরাটে দীননাথ বাত্রার বইতে মহাভারতে স্টেম সেলের তত্ত্ব আছে বলে যে অবাস্তব কথা পড়ানো হচ্ছে, সেই ঐতিহ্য! নাকি, গত বছর মুম্বইতে অনুষ্ঠিত ১০২ তম বিজ্ঞান কংগ্রেসে সাত হাজার বছর আগে বৈদিক বিমানের যে গালগল্প শোনানো হয়েছিল সেই ঐতিহ্য! ওই বিজ্ঞান কংগ্রেসেই প্রাচীনকালে গরু এবং হাতির মূত্র দিয়ে বিমানের জ্বালানি, মঙ্গলগ্রহে ভারতীয় রাজার শিরস্ত্রাণ পাওয়ার মতো গল্পও শোনানো হয়েছিল।

এই ধরনের অবাস্তব মিথ্যা কল্প কাহিনীই কি তবে ভারতীয় ঐতিহ্য? ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চর্চা হয়েছিল, তা কোনও অতিপ্রাকৃত, অবাস্তব, দৈবিক এবং দুনিয়ার সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয় ছিল না। বিশ্বের মানবজাতির এক অংশ হিসাবেই ভারতীয়রা প্রকৃতির শক্তিকে জানবার প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের চর্চা করেছে। সে যুগের বিচারে অত্যন্ত উন্নত মানের চর্চা ভারতে হলেও ইতিহাসই দেখিয়েছে একসময় এই বিজ্ঞান চর্চা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। কেন এমন হল? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রিতে এর জন্য মূলত তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জাতিভেদ প্রথা, মনু এবং তার পরবর্তী পুরাণগুলিতে আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতিকে ধর্মীয় নিগড়ে কঠোরভাবে বেঁধে দেওয়া এবং বেদান্ত, বিশেষত শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের মতো ভাববাদী দর্শনগুলির প্রভাবই এর জন্য দায়ী। প্রফুল্লচন্দ্র গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, “প্রকৃতিজগতের ঘটনাকে বুঝতে, কেন এবং কেমন করে, এই প্রশ্ন তোলা—কার্য-কারণের সমন্বয়কে বোঝা— এগুলি ক্রমাগত দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যেতে থাকল। এভাবেই কষ্টকল্পনা ও অলৌকিক চিন্তার প্রতি ঝুঁকে থাকা জাতির মধ্যে থেকে অনুসন্ধিৎসার শক্তি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল, এই পথেই একদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আরোহ যুক্তির ভিত্তিতে বিজ্ঞান চর্চাকে বিদায় জানালো ভারত। একজন বয়েল, একজন দেকার্তে, একজন নিউটনের জন্ম দেওয়ার পক্ষে তার মাটি নৈতিকভাবে অযোগ্য প্রতিপন্ন হয়ে পড়ল এবং তার নামটি পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতের মানচিত্র থেকে মুছে গেল।” (হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি)।

আজ বিজেপি-সংঘ পরিবার এই অন্ধতাকেই ভারতীয়ত্ব বলে চালাতে চাইছে। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ এবং স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে কংগ্রেস-বিজেপির মতো যে দলই ক্ষমতায় এসেছে তারাই ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে কূপমণ্ডুকতা, ধর্মীয় অন্ধতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসকে শিক্ষার সাথে মেলাতে চেয়েছে। তা সত্ত্বেও যতটুকু গণতান্ত্রিক-বৈজ্ঞানিক চিন্তা আজও টিকে আছে, তাকেও গলা টিপে হত্যা করে চিন্তাজগতকে চূড়ান্ত যুক্তিহীনতা এবং ফ্যাসিবাদী অন্ধতার ধাঁচায় ঢেলে সাজাতে চাইছে বিজেপি। তাই বারবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চে তারা ঐতিহ্যের নামে অন্ধতা এবং যুক্তির পরিবর্তে বিশ্বাসের জিগির তুলছে। যাতে দেশের বেশিরভাগ মানুষ সঠিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির বদলে মনগড়া এবং অন্ধতার ধারণাকেই বিজ্ঞান বলে মেনে নেয়। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিজ্ঞান এবং যুক্তির চর্চার কবর খোঁড়া হবে। চিন্তা জগতে কায়েম তুকতাক সহ নানা কুসংস্কার, যুক্তিহীনতা, দৈব নির্ভরতা, যা দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েমের পথকে সুগম করবে।

এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসে মধ্যপ্রদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রেগুলেটারি কমিশনের চেয়ারম্যান অখিলেশ পাণ্ডে এই কাজটাই করতে চেয়েছিলেন। পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণাপত্র পড়ার জন্য নির্দিষ্ট সেমিনারে তাঁর বিষয় ছিল, ‘শিব বিশিষ্ট পরিবেশবিদ’। শিবের রুদ্রাক্ষের মালা, জটা থেকে গঙ্গার উৎপত্তি হওয়ার কিংবদন্তি এবং বাঘ ছালের উপর শিবের আসন ইত্যাদিই নাকি পরিবেশের দ্যোতক। এই ধরনের নানা কিছু বিষয় উল্লেখ করলেও কোথাও তিনি এর কোনও যুক্তিসঙ্গত বা তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা দেননি। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি পায়ে ব্যথার অজুহাতে হাজির না হওয়ায় তাঁর তথাকথিত ‘গবেষণাপত্রে’র সারাংশটুকুই কেবলমাত্র পেশ করা হয়। ফলে তাঁকে আর সেমিনারে উপস্থিত শ্রোতাদের প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়নি। কিন্তু সংঘ পরিবারের মতলবটি ঠিকই তিনি হাসিল করে নিয়েছেন। উপস্থিত বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এই ধরনের আদ্যন্ত আজগুবি একটি পেপার বিজ্ঞান কংগ্রেসে অন্তর্ভুক্ত হল কী করে — এই প্রশ্ন তুললে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভাগের চেয়ারম্যান গঙ্গাধর মিশ্র নির্বিকার উত্তর দেন— পেপার নির্বাচন করা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব ব্যাপার, তাই তিনি কোনও ব্যাখ্যা দেবেন না। রাজীব শর্মা নামে আর একজন আমলা অ্যানথ্রোপলজিক্যাল অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল সায়েন্স বিভাগের সিম্পোজিয়ামের মঞ্চে বলতে উঠে শাঁখ বাজাতে শুরু করেন। তাঁর দাবি শাঁখ বাজালে সাদা চুল কালো হয় এবং অসংখ্য রোগ সেরে যায়। তিনি নাকি অনেককে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভালও করে দিয়েছেন। ভারতের মতো দেশে যেখানে পদে পদে অন্ধবিশ্বাস ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে এই ধরনের দাবিদার কম নেই। তাহলে তারাও এবার সব বিজ্ঞান কংগ্রেসে এসে উপস্থিত হবে নাকি?

সত্যকে তুলে ধরা এবং কুসংস্কার-অর্ধসত্য-মনগড়া-ধারণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য নিয়েই বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেই বিজ্ঞান এগিয়েছে। বিজ্ঞানকে কিংবদন্তী, ধর্মীয় ঐতিহ্য বা ধর্মবিশ্বাসের সাথে মেলানো চলে না। কোনও মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এমনকী কোনও বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত বিশ্বাসও বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান হল সুনির্দিষ্ট যুক্তিধারায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত জ্ঞান। গবেষণা করা মানে, মনগড়া কিছু ধারণার ভিত্তিতে বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করে একটা গুরুগম্ভীর পেপার লিখে ফেলা নয়। গবেষণারও বিজ্ঞানসম্মত রীতিনীতি আছে। তা ব্যতিরেকে যে কোনও অভিজ্ঞতা এবং মতামতই বৈজ্ঞানিক গবেষণা হিসাবে গণ্য হয় না। তাহলে এই সমস্ত অবাস্তব দাবি সংবলিত পেপার বিজ্ঞান কংগ্রেসে পড়তে দেওয়া হচ্ছে কেন? কর্তৃপক্ষ বলছেন, তাঁরা বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে নানা ধরনের পেপার পড়তে দিচ্ছেন। কিন্তু সেটা বিজ্ঞান হতে হবে তো! এমনিতেই ভারতে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, তুকতাক, ডাইনিবিদ্যা, ওঝা-গুনিনের কেরামতির মতো নানা অবৈজ্ঞানিক ধারণার পরিমণ্ডল সমাজের বিরাট অংশে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তার উপর বিজ্ঞানের নামে এ জিনিস চললে তা মানুষের মধ্যে আরও গেড়ে বসবে। বিজ্ঞান কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কি এই সব কিছুকেই বিজ্ঞান-জনপ্রিয়তার মোড়কে আনার ঠিকা নিয়েছেন?

বিজেপি ক্ষমতায় বসার পর থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রকে তাদের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অ্যাজেন্ডা অনুসারে ঢেলে সাজাতে কোমর বেঁধে নেমেছে। মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বিভেদ সৃষ্টির অন্যতম হাতিয়ার হিসাবেই তারা উগ্র হিন্দুত্বের জিগিরকে ব্যবহার করতে চাইছে। এ শুধু ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির কৌশল নয়। এর সর্বনাশের শিকড় আরও বহু গভীরে বিস্তৃত। দেশের প্রকৃত মালিক পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের শাসন-শোষণকে অব্যাহত রাখতে মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই ধ্বংস করতে চাইছে। বহু আগেই এই হুঁশিয়ারি দিয়ে এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন যে, ফ্যাসিবাদ মানুষের চিন্তাভাবনাকে মেরে দেয়। তিনি দেখান, ‘ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ, তমসাচ্ছন্ন ভাবনাধারণা এবং যুক্তিহীনতার সাথে কারিগরি বৈজ্ঞানিক বিদ্যার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এরকম ঘটনা যখন দেশে ঘটে তখন যুক্তিবাদী মন দেশে মরে যায়।’ বিজেপি ক্ষমতায় বসে এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। এর বিরুদ্ধে সচেতন মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জরুরি।

মেখলিগঞ্জে কে কে এম এস সম্মেলন

কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম, সরকারি উদ্যোগে ন্যায্য দামে ধান ক্রয়, মেখলিগঞ্জ-হলদিবাড়ি সংযোগকারী তিস্তা ব্রিজের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, মেখলিগঞ্জে হিমঘর নির্মাণ, কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়ার কালা অর্ডিন্যান্স বাতিল করা প্রভৃতি দাবিতে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ডাঙ্গারহাটে ৫ জানুয়ারি এ আই কে কে এম এস-এর দ্বিতীয় ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রুহল আমিন। ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কমরেড জগদীশ অধিকারীকে সম্পাদক ও কমরেড বিনোদ রায়কে সভাপতি নির্বাচিত করে ২২ জনের ব্লক কমিটি গঠন করা হয়।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড ননী মণ্ডল ৯ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। কয়েক বছর যাবৎ তিনি উচ্চমাত্রায় ব্লাড সুগারে আক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা অনেকটাই হারিয়েছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে দলের সঙ্গে যুক্ত হন।

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলন এবং স্থানীয় স্তরে নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। মালিকী শোষণের বিরুদ্ধে বিড়ি শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগও নিয়েছিলেন। অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা তিনি সর্বস্তরের মানুষকে কাছে টানতে পারতেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অধিকারী না হলেও দলের বক্তব্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে জনগণের কাছে তুলে ধরতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুখেন্দু সেনগুপ্ত, লোকাল সম্পাদিকা কমরেড বুলবুল দাস সহ কর্মী-সমর্থকেরা তাঁর বাসস্থানে যান এবং মাল্যদান করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড ননী মণ্ডল লাল সেলাম

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার নারায়ণীতলা অঞ্চলের সরবেড়িয়া গ্রামসভার প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড তারাপদ সাহা ২৮ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ১৯৬৬ সালে দলের সাথে যুক্ত হন। পার্টির প্রতিটি কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। কোনও কাজকে ছোট মনে করতেন না। তিনি তরুণ কমরেডদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও দরদি মনের মানুষ ছিলেন।

নিয়মিত গণদাবী ও মার্কসবাদী চিন্তাবিদ শিবদাস ঘোষের বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। এই বয়সেও প্রতি বছর শারদীয় বুক স্টলে তিনি অংশগ্রহণ করতেন এবং সারাক্ষণ থাকতেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ শোনা মাত্র পার্টির সমর্থক দরদি এবং লোকাল কমিটির সদস্যরা উপস্থিত হন। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পিন্টু ঘোষ এবং ওই গ্রামের প্রবীণ সদস্য কমরেড মহাদেব সাহা।

কমরেড তারাপদ সাহা লাল সেলাম

জীবনাবসান

বর্ধমান জেলার সালানপুর সাংগঠনিক লোকাল কমিটির কর্মী এবং বিহার কোল মাইনার্স ইউনিয়নের বাসন্তী মাতা কোলিয়ারি শাখার সভাপতি কমরেড পরেশ কোড়া ২৫ ডিসেম্বর ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর।

তিনি অল্প বয়সে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। কয়লাখনি শ্রমিক হিসাবে প্রথম জীবনে বরাকরের বেগুনিয়া বাসন্তী মাতা কোলিয়ারিতে শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়াও সালানপুরের বালাজি গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেডে প্রথম সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর বাড়ি ছিল সমস্ত কমরেডদের জন্য অবারিত।

তাঁর মৃত্যুতে ইউনিয়ন এবং দল একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কমরেডকে হারাল।

কমরেড পরেশ কোড়া লাল সেলাম

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

জে ভি স্ট্যালিন

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গভীর ভাবে চর্চার প্রয়োজনীয়তা থেকেই আমরা মহান নেতাদের নানা রচনা প্রকাশ করছি।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। এই দর্শনের নাম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, কারণ বস্তুজগতের সমস্ত ফেনোমেনাকে* বিচারের ক্ষেত্রে এর দৃষ্টিভঙ্গি, সেগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে এর পদ্ধতি হল দ্বন্দ্বমূলক (ডায়ালেকটিক্যাল) এবং বস্তুজগতের সমস্ত ফেনোমেনার ব্যাখ্যা, ধারণা ও তত্ত্ব হল বস্তুবাদী (মেটেরিয়ালিস্টিক)। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলনীতিকে সমাজজীবন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সমাজবাস্তব ও সমাজবিকাশের ইতিহাস অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই মূল নীতিগুলিকে প্রয়োগ করেই গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

মার্কস-এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে প্রায়শই বলেছেন— দার্শনিক হিসাবে হেগেলই প্রথম দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রবদ্ধ করেন। অবশ্যই এ-কথার অর্থ এই নয় যে, মার্কস-এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বতত্ত্ব এবং হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব অবিকল একই জিনিস। বস্তুত, মার্কস ও এঙ্গেলস হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভাববাদী খোলসটা বর্জন করে তার 'যুক্তিসঙ্গত নির্যাসটি' গ্রহণ করে তাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়েছিলেন।

"আমার দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি" মার্কস বলেছেন, "হেগেলের থেকে কেবল ভিন্ন নয়, ঠিক তার বিপরীত। হেগেলের মতে, চিন্তাপ্রক্রিয়া— যাকে তিনি 'পরমভাব' আখ্যা দিয়ে এমনকী একটা সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তায় রূপান্তরিত করেছেন— সেই 'পরমভাবই' বস্তুজগতের স্রষ্টা, বস্তুজগৎ সেই পরমভাবেরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যরূপ। এর বিপরীতে, আমাদের কাছে ভাবজগৎ হল মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত এবং চিন্তার আকারে রূপান্তরিত বস্তুজগৎ— এ ছাড়া আর কিছু নয়" *(কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, ২য় জার্মান সংস্করণের ভূমিকা)*।

বস্তুবাদ সম্পর্কে নিজেদের ধারণা তুলে ধরতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রায়শই ফুয়েরবাখের নাম করেছেন, দার্শনিক হিসাবে যিনি বস্তুবাদকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। যদিও তার মানে এই নয় যে, মার্কস-এঙ্গেলসের বস্তুবাদ এবং ফুয়েরবাখের বস্তুবাদ অভিন্ন। বস্তুত, তাঁরা ফুয়েরবাখের বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভাববাদী ও ধর্মনৈতিক ধ্যানধারণার অনাবশ্যক বোঝাকে বর্জন করে, এর "অন্তর্নিহিত সারবস্তু"কে গ্রহণ ও তাকে বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী দর্শন তত্ত্বের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। সকলেই জানেন যে, ফুয়েরবাখ মূলত বস্তুবাদী হলেও, বস্তুবাদ শব্দটি ব্যবহার করতে আপত্তি করেছিলেন। এঙ্গেলস একাধিকবার বলেছেন, "বস্তুবাদী ভিত্তির উপর দাঁড়ালেও ফুয়েরবাখ ছিলেন ... চিরাচরিত ভাববাদী দর্শনের শৃঙ্খলেই আবদ্ধ এবং যখনই আমরা ধর্ম ও নীতি শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর মত লক্ষ করি তখনই ফুয়েরবাখের আসল ভাববাদী স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে" *(লুডউইগ ফুয়েরবাখ অ্যান্ড দি এন্ড অফ ক্ল্যাসিকাল জার্মান ফিলজফি)*।

ডায়ালেকটিকস কথাটা এসেছে গ্রিক 'ডায়ালিগো' থেকে, যার অর্থ হল আলোচনা করা, তর্কবিতর্ক করা। প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তগুলির স্ববিরোধিতা উদ্‌ঘাটন করা এবং সেইসব স্ববিরোধিতাকে অতিক্রম করার পথে সত্যে পৌঁছানোর পদ্ধতিকে প্রাচীনকালে বলা হত ডায়ালেকটিকস। প্রাচীনকালে একদল দার্শনিক মনে করতেন চিন্তার স্ববিরোধিতা উদঘাটন ও পরস্পরবিরোধী মতামতের সংঘাতই সত্যে উপনীত হওয়ার শ্রেষ্ঠ পথ। পরবর্তীকালে এই ডায়ালেকটিক (দ্বন্দ্বমূলক) চিন্তাপদ্ধতি প্রকৃতি জগতের ফেনোমেনাকে বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং প্রকৃতিকে জানার দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি হিসাবে গড়ে ওঠে। দ্বন্দ্বমূলক চিন্তাপদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সমস্ত কিছুকেই সর্বদা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল হিসাবে বিচার করা হয়। এই পদ্ধতি দেখায় — প্রকৃতিজগতের বিকাশ তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের বিকাশের ফল, অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল।

মর্মবস্তুর দিক থেকে দ্বন্দ্বতত্ত্ব মেটাফিজিক্সের* সম্পূর্ণ বিপরীত।

১। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইরকম—

ক) মেটাফিজিক্সের ঠিক বিপরীতে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মনে করে— প্রকৃতিজগৎ পরস্পর সম্পর্কহীন, স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন কিছু বস্তু বা ঘটনার আকস্মিক সমাবেশ নয়। বরং দ্বন্দ্বতত্ত্ব দেখায় প্রকৃতি জগতে সবকিছুই পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। সামগ্রিকভাবে সুসংহত এই বস্তুজগতে সমস্ত ফেনোমেনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের দ্বারা নির্ধারিত।

কাজেই, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দেখায়, পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, পৃথকভাবে দেখলে প্রাকৃতিক কোনও ফেনোমেনাকে বোঝা সম্ভব নয়। প্রকৃতিজগতের কোনও ফেনোমেনাকে পরিবেশের বাইরে এনে বা তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করলে আমাদের কাছে তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বরং, প্রকৃতপক্ষে কোনও ফেনোমেনাকে যদি তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রেখে বিচার করা যায়, পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে বুঝে বিচার করা যায় তবেই সেই

ফেনোমেনাকে ঠিকমতো বোঝা সম্ভব।

খ) মেটাফিজিক্সের বিপরীতে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দেখায় যে, বিশ্বপ্রকৃতি গতিহীন নিশ্চল নয়, স্থাণু বা অপরিবর্তনীয় নয়;অবিরাম গতি ও পরিবর্তনের মধ্যে, নিরন্তর নতুনের আবির্ভাব ও বিকাশের মধ্যেই তা অবস্থান করে। প্রকৃতিজগতে সর্বদাই কিছু না কিছু নতুন সৃষ্টি হয় ও বিকশিত হয়, আবার কিছু না কিছুর আয়ু শেষ হয়, তার বিনাশ ঘটে।

তাই প্রতিটি ফেনোমেনাকে বিচারের সময় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রভাবের দিকগুলিকেই শুধু নয়, সেই সঙ্গে তার গতি, পরিবর্তন, বিকাশ; তার উদ্ভব ও বিনাশ — এই সমস্ত দিকগুলি নিয়ে বিচার করাই হল দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি।

কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তে যে জিনিসকে দেখলে স্থায়ী মনে হয় অথচ ইতিমধ্যেই যার ভিতরে বিনাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, তাকে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি প্রাধান্য দেয় না। বরং একটা বিশেষ সময়ে আপাতভাবে দুর্বল মনে হলেও যা নবীন ও বিকাশশীল, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি তাকেই গুরুত্ব দেয়। কারণ, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি অনুযায়ী যা নবীন ও বিকাশশীল, সেটাই একমাত্র অপরাজেয়।

এঙ্গেলস বলেছেন — "সমগ্র প্রকৃতি জগতে — ক্ষুদ্রতম কণা থেকে শুরু করে বৃহত্তম বস্তু, এক কণা বালি থেকে সূর্য পর্যন্ত, আদিম প্রাণী কোষ (প্রোটোজোয়া) থেকে মানুষ পর্যন্ত — সব কিছুই সতত সৃষ্টি এবং বিনাশের ধারায়;অন্তহীন প্রবাহ, বিরামহীন গতি ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে" *(ডায়ালেকটিকস অব নেচার)*।

এজন্যই এঙ্গেলস আরও বলেছেন, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে "প্রতিটি বস্তুকে এবং চিন্তাজগতে তার নিয়ত প্রতিফলনকে প্রধানত তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গী সংযোগ, গতি, সৃষ্টি ও বিনাশের পরিপ্রেক্ষিতে রেখেই বিচার করা হয়" *(অ্যান্টি ড্যুরিং)*।

গ) মেটাফিজিক্স বলে, বিকাশের প্রক্রিয়া হল সরলরেখায় এগিয়ে যাওয়া, যেখানে শুধু পরিমাণগত পরিবর্তনই ঘটে, তা আর গুণগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায় না। মেটাফিজিক্সের বিপরীতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব দেখায়, বিকাশের ধারায় সূক্ষ্ম ও দৃষ্টির অগোচর পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে সুস্পষ্ট মৌলিক পরিবর্তন, গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ ঘটে। এই ধারায় গুণগত পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্নভাবে ধীরে ধীরে ঘটে না। ঘটে দ্রুত, আচমকা;এক অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে ভিন্ন অবস্থায় উত্তরণ ঘটে;এই উত্তরণ কার্যকারণহীন কাকতলীয় নয়, নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চোখের আড়ালে অবিরাম তিল তিল পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলেই গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি দেখায়, বিকাশের প্রক্রিয়া একটি বৃত্তাকার পথে বার বার ঘোরা নয় বা যা ঘটে গিয়েছে তারই গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি নয়। বিকাশের প্রক্রিয়া অগ্রাভিমুখী, উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ের দিকে তা এগিয়ে চলে। গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একদিন গড়ে ওঠা পুরনো পর্যায় থেকে গুণগতভাবে নতুন পর্যায়ে উত্তরণ, সরল থেকে জটিল, নিম্নতর থেকে উচ্চতর স্তরে বিকাশই এর প্রকৃতি।

এঙ্গেলস বলেছেন — "প্রকৃতিই হল দ্বন্দ্বতত্ত্বের সত্যতা প্রমাণের কষ্টিপাথর। এর সত্যতা যাচাইয়ের যেসব উপকরণ আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, তা অতীব সমৃদ্ধ। প্রতিদিন আরও বেশি বেশি যে-সব উপকরণ আমাদের হাতে আসছে, তার দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রকৃতির কর্মপ্রক্রিয়া দ্বন্দ্বমূলক (ডায়ালেকটিক্যাল), মেটাফিজিক্যাল নয়। প্রকৃতির কর্মপ্রক্রিয়া চিরকাল একইভাবে চলছে না; একইভাবে বারবার বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে আসছে না; বরং বাস্তব ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তা চলেছে। এখানে সকলের আগে আমাদের ডারউইনের কথা স্মরণ করতে হবে। আজকের গোটা জীবজগৎ, জীবজন্তু, গাছপালা এবং সাথে সাথে মানুষও কোটি কোটি বছর ধরে ক্রমবিকাশের ফলেই গড়ে উঠেছে — একথা প্রমাণ করার দ্বারা ডারউইন প্রকৃতিজগৎ সম্পর্কে মেটাফিজিক্যাল ধারণার উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছেন" *(সোস্যালিজম ঃ ইউটোপিয়ান অ্যান্ড সায়েন্টিফিক)*।

দ্বন্দ্বমূলক ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াকে পরিমাণগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে গুণগত পরিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন— "পদার্থবিজ্ঞানে ... প্রতিটি রূপান্তর হল — পরিমাণগত পরিবর্তনের পথে গুণগত পরিবর্তন; কোনও বস্তুর অভ্যন্তরীণ অথবা বাইরে থেকে প্রদত্ত গতির পরিমাণগত পরিবর্তনের ফল। যেমন, জলে তাপ দিলে প্রথমে তার তরল অবস্থার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু তাপ বাড়াতে বা কমাতে থাকলে একটা সময় আসে যখন তার বিদ্যমান অবস্থাটা বদলে যায়। একক্ষেত্রে জল বাষ্পে, অন্যক্ষেত্রে বরফে পরিণত হয়। একটা ন্যূনতম পরিমাণ তড়িৎ শক্তি দিলে তবে একটা প্ল্যাটিনামের তার জ্বলে, আলো দেয়। প্রতিটি ধাতুকে গলাবার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় উত্তাপ দেওয়ার ব্যবস্থা যদি আমাদের থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাব, একটি নির্দিষ্ট চাপে প্রতিটি তরল পদার্থের ঘনীভবন ও বাষ্পীভবনের একটি সুনির্দিষ্ট তাপাঙ্ক রয়েছে। তেমনভাবেই প্রতিটি গ্যাসের একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তিবিন্দু আছে, সেইমতো চাপে ও শৈত্যে গ্যাসকে তরলে পরিণত করা যায়। ...পদার্থবিজ্ঞানে যেগুলিকে ধ্রুবক বলা হয় (যে বিন্দুগুলিতে এক অবস্থা থেকে অন্য আর এক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে— স্ট্যালিন) সেগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ক্রান্তিবিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়— এই ক্রান্তিবিন্দুগুলির প্রত্যেকটিতে এসে গতির (অর্থাৎ বিকাশের) পরিমাণগত হ্রাস বা বৃদ্ধি অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বস্তুর মধ্যে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করে এবং তার ফলে পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য গুণগত বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়" *(ডায়ালেকটিকস অব নেচার)*।

রসায়ন শাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন— "পদার্থের উপাদানগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে তার মধ্যে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে— সেই সম্পর্কিত বিজ্ঞানই হল রসায়ন শাস্ত্র। হেগেলও এই কথাটা জানতেন। যেমন অক্সিজেনের কথা ধরা যাক। সাধারণভাবে অক্সিজেনের অণুতে দুটি পরমাণু থাকে। তার বদলে যদি তিনটি পরমাণু নিয়ে অণুটি গঠিত হয়, তাহলে আমরা পাই ওজোন। এটি এমন একটি পদার্থ যার গন্ধ এবং ক্রিয়া সাধারণ অক্সিজেনের থেকে অবশ্যই পৃথক। তা ছাড়া, যেভাবে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট অনুপাতে নাইট্রোজেন অথবা গন্ধকের সঙ্গে অক্সিজেন মিলে বিশেষ বিশেষ যৌগ তৈরি হয়, যাদের প্রত্যেকটি অন্যটি থেকে গুণগতভাবে পৃথক

ছয়ের পাতায় দেখুন

---

* ফেনোমেনা — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও ঘটনা এবং সে সম্পর্কে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত ও গঠিত জ্ঞান।

* মেটাফিজিক্স — সেই সব দর্শন যা পরম বা মূল সত্যকে বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে এবং বুদ্ধি দ্বারা অনুমান সাপেক্ষ মনে করে। এক কথায় মেটাফিজিক্স বলতে ভাববাদ বোঝায়।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

জনস্বাস্থ্য ঃ আন্দোলনের হাওয়া কি কাড়ছে এস ইউ সি আই (সি)?

মাঝে মাত্র পাঁচটা বছর। এই পাঁচ বছরে রাজ্য রাজনীতিতে যেমন ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি সিপিএম, ঠিক তেমনই অবস্থা দলের ডাক্তার সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরস-এর (এ এইচ এস ডি)।

২০১০ সালে, যখন সিপিএম-এর অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে, বামপন্থী সূর্য কোনওদিন অস্ত যাবে না, সেই সময় দলের ডাক্তার সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ছ'হাজার। এ এইচ এস ডি-র নাম শুনলে সে সময় স্বাস্থ্য বিভাগে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার জোগাড় হত। হেলথ সার্ভিস, মেডিকেল এডুকেশন, প্রশাসন মিলিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্যপরিষেবায় সবশুদ্ধ ডাক্তারই ছিলেন সাত হাজার। তার মধ্যে এ এইচ এস ডি-র সদস্যই ছিল সাড়ে ছয় হাজার। আর ২০১৫ সালের শেষে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মেরেকেটে ১৫০০ (শেষবার সদস্যের হিসাব হয়েছিল ২০১৪ সালে, প্রতি দু'বছর অন্তর একবার হওয়া বার্ষিক সম্মেলনের সময়) অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার সদস্য কমেছে এ এইচ এস ডি-র।

অন্যদিকে, ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তৃণমূলের সদ্যগঠিত ডাক্তার সংগঠন প্রোগ্রেসিভ সার্ভিস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের (পিএসডিএ) সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ১১। তা বর্তমান বাড়তে বাড়তে কত হয়েছে, সেই হিসাব স্পষ্ট নয়।

ক্ষমতার পাল্লা যেদিকে থাকবে, সেদিকেই ঝুঁকবেন ডাক্তারবাবুরা, এ আর নতুন কী। কিন্তু বামপন্থী ডাক্তারদের কাছে সমস্যাটা আরও গভীরে। ট্রেনি রিজার্ভ, শূন্যপদ পূরণ, পরিকাঠামোগত খামতি দূর করা, শিশু মৃত্যু, স্বেচ্ছাবসরসহ হাজারো একটা ইস্যুতে তাঁদের পালের হাওয়া প্রায় কেড়ে নিচ্ছে এস ইউ সি আই (সি) সমর্থিত ডাক্তার সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম। একটা কিছু হলেই হল! বিবৃতি, সাংবাদিক বৈঠক, রাস্তায় নামা, স্বাস্থ্য ভবনে ডেপুটেশন — স্বাস্থ্যকর্তাদের অস্থির করে রেখেছে এই সংগঠন। শুধু ফোরামই নয়, একইসঙ্গে আন্দোলনে নেমে পড়েছে এস ইউ সি আই (সি) সমর্থিত আরও বিভিন্ন সংগঠন, নার্সেস ইউনিটি, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি প্রভৃতি। অন্যদিকে সিপিএমের নার্সিং, ডেন্টাল, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি শাখা একসময় সক্রিয় থাকলেও এখন সেগুলি প্রায় সব ক'টিই নিষ্ক্রিয়।

এস ইউ সি আই (সি) সমর্থিত সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাসের দাবি, ছ'বছর আগে আমাদের সংগঠনের সূত্রপাত। তখন সদস্য ছিল ২০-২২ জন। এখন ছ'শোর বেশি। গত চার বছরে সদস্য বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। তাঁর দাবি, শুধু সিপিএমের ডাক্তার সংগঠনই নয়, আমরা তৃণমূলের ডাক্তার সংগঠনের কাছেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সমস্ত বড় ইস্যু নিয়ে আমরাই আন্দোলনে নেমেছি। নামবও।

(বর্তমান, ৭.১.২০১৬)

টোকাটুকির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

একের পাতার পর

ঢুকে টুকলি সাপ্লাই করে। সংবাদে প্রকাশ, কিছু অভিভাবক শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে তৃণমূলের ছাত্রনেতারা এবং বিধায়ক এই 'গুরুদায়িত্ব' নিয়েছিলেন। অভিযুক্ত টিএমসিপি নেতাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ ইতিপূর্বেও এসেছে। কিন্তু সমস্ত তথ্যপ্রমাণ

কলকাতা মেডিকেল কলেজে বিক্ষোভ। ৯ জানুয়ারি

'উলগুলান' বার্ষিকীতে আদিবাসীদের অধিকারের দাবি

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ৯ জানুয়ারি ছোটনাগপুরের ডোমবারি পাহাড়ে সাম্রন্তপ্রভু এবং ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শত শত শোষিত মানুষ বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে জীবন দিয়েছিলেন। এই লড়াই 'উলগুলান' আজও শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণার উৎস। এই দিনটিকে স্মরণ করে ৯ জানুয়ারি কলকাতার এসপ্ল্যানেডে ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশন এক সভার আয়োজন করে। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বহু মানুষ এই সভায় অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সংগঠনের সভাপতি সারদা প্রসাদ কিস্কু। অল সান্তাল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লি-র সহসভাপতি ডাঃ জীতেন্দ্রনাথ মুর্মু, অধ্যাপক সুহৃদ কুমার ভৌমিক, ওড়িশার মুণ্ডা সংগঠন সাঁওয়ার জামদা'র

সভাপতি নন্দলাল সিং, গোটা ভারত হুল বৌসি, দুমকা-র সম্পাদক বিজয় টুডু প্রমুখ। ডঃ নবকুমার দুয়ারি লিখিত বার্তা পাঠান।

প্রারম্ভিক ভাষণ দেন পরিমল হাঁসদা। সকল বক্তাই বিরসা মুণ্ডার জীবন সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরে বর্তমান সময়ের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলেন। উন্নয়নের নামে নির্বিচার উচ্ছেদ ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের উপর অত্যাচার বন্ধ, চাষির ফসলের ন্যায্য দাম, সকল বেকারের চাকরি প্রভৃতি দাবিতে সোচ্চার হন তাঁরা। রাজ্যপালের কাছে আদিবাসীদের নানা দাবি নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সমাপ্তি ভাষণ দেন সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি বিসম্বর মুড়া। সভা সঞ্চালনা করেন জগদীশ সিং। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শিখা মাণ্ডি ও সম্প্রদায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বেলদাঃ ৪ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় গান্ধীপার্কে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশন-এর স্থানীয় ব্যক্তিত্ব মুদিরাম সিং। প্রধান বক্তা ছিলেন সাবিত্রী মাহাত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন লোক কবি পরেশ বেরা, চন্দ্রকান্ত সিং প্রমুখ।

সহযোগে স্বাস্থ্য দপ্তরে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও প্রতিকার হয়নি। অন্য দিকে ডাঃ নির্মল মাজির মদতে সমগ্র মেডিকেল শিক্ষায় চূড়ান্ত দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও দলবাজি চলছে, তাতে মেডিকেল শিক্ষার মান ধ্বংস হচ্ছে এবং ছাত্র-চিকিৎসকদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, চিকিৎসক নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাদের টার্গেট করে পরীক্ষায় ফেল করানোর মতো ঘটনাও ঘটছে। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে একমাত্র বিরোধী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র ছাত্রনেতারা এভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন।

ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় দাবি জানিয়েছেন, ১) ডাঃ নির্মল মাজিকে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি সহ সমস্ত সরকারি পদ থেকে অপসারণ করতে হবে এবং টোকাটুকির ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে তাঁকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে, ২) সমস্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে টিএমসিপি নেতা সহ সমস্ত দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, ৩) তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেপিসি মেডিকেল কলেজের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ স্থগিত রাখতে হবে, ৪) মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষায় শাসক দলের মদতে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ বন্ধ করতে হবে, ৫) রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ফেল করানোর ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে।

মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের বিক্ষোভ

অল বেঙ্গল প্যারামেডিকেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে ১৫টি জেলা হাসপাতাল ও ৫৩টি ব্লাড ব্যাঙ্কের দুই শতাধিক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ৬ জানুয়ারি স্বাস্থ্যভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের সভাপতি তথা এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে

সম্পাদক মানস মুখার্জী সহ ছয় জনের প্রতিনিধি দল স্পেশাল সেক্রেটারির নিকট দাবিপত্র পেশ করে। তাঁদের দাবি, বিভিন্ন প্রোজেক্টে চুক্তিতে কর্মরতদের স্থায়ীকরণ, শূন্য স্থায়ীপদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ, ২০০৬ সালের আগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের ফ্যাকাল্টি দ্বারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডি এম এল টি প্রদান, কাউন্সিল গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করা, হেল্‌থ হ্যাজার্ড ভাতা চালু করা, প্যারা মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড দেওয়া, চুক্তি প্রথা বাতিল, বিনা কারণে ডি এল টি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাইরে না রাখা ইত্যাদি। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য।

সহায়ক মূল্যে ধান কেনার দাবিতে এগরায় কৃষক বিক্ষোভ

ধান কেনার নামে রাজ্য সরকার চাষিদের সঙ্গে চরম রসিকতা করে চলেছে। আন্দোলনের চাপে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা, পটাশপুর এলাকায় ধান কেনার জন্য সরকার ব্লকে একটি করে কিষাণ মাণ্ডি খোলার কথা বললেও নিয়ম করা হয়েছে, মাসে একদিন বা দু'দিন একটি করে অঞ্চলের ধান কেনা হবে। তাও প্রতি অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৪০ জন চাষি ধান বিক্রি করতে পারবেন। অর্থাৎ বুথ প্রতি ২-৩ জন মাত্র চাষি ধান বিক্রি করার সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে যথারীতি দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ চলছে। চাষিদের নামের তালিকা তৈরি করছেন গ্রাম প্রধান। তাঁদের সুপারিশ পেলে তবে জমির প্রমাণপত্র দেখিয়ে চাষিরা চেক পাবেন। ভাগচাষি-বর্গাচাষিদের কোনও সুযোগ নেই। ফলে অধিকাংশ চাষি ধান বিক্রি করতে পারছেন না।

সমস্যা রয়েছে আরও। কোনও কোনও অঞ্চল থেকে কৃষক মাণ্ডির দূরত্ব ৪০-৫০ কিলোমিটার। ফলে পরিবহণের জন্য বাড়তি খরচ হচ্ছে। এছাড়া কুইন্টাল পিছু ১০-১২ কেজি ধান অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে, ধান শুকনো নয় এই অজুহাতে।

এই হল রাজ্য সরকারের বহু ঘোষিত চাষি সহায়ক কৃষক মাণ্ডি।

এর প্রতিকারের দাবিতে ৪ জানুয়ারি এ আই কে কে এম এসের নেতৃত্বে কৃষকরা এগরা এস ডি ও দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনা করে খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়ায় বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। এদিনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কে কে এম এস-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জগদীশ সাউ, জেলা কমিটির সদস্য বলাই দাস প্রমুখ।

নতুন সংগ্রামী রেল-কর্মচারী ফেডারেশন গড়ার পরিকল্পনা

রেল কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে ও সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জরুরি প্রয়োজনকে প্রতিষ্ঠিত কর্মচারী ফেডারেশনগুলির নেতৃত্ব যেভাবে অবহেলা করে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, তার প্রতিবাদে ও যথার্থ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ভারতের পাঁচটি কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ৭ জানুয়ারি অন্ধ্রপ্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদে একটি কনভেনশনে মিলিত হন। এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে নতুন কর্মচারী ফেডারেশন গঠন করার প্রাথমিক আলোচনায় এ আই ইউ টি ইউ সি-র অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সুব্বা রেড্ডি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমরেড সোমশেখর, কমরেড এম বি থারাইদাস প্রমুখ।

পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ
তীব্র প্রতিবাদ জানাল এ আই ডি এস ও

ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার (এফটিআইআই) চেয়ারম্যান পদে আর এস এস অনুগত গজেন্দ্র চৌহানের নিয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করেছে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র ৯ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, কিছু নিম্নমানের হিন্দি ছবি এবং মহাভারত টিভি সিরিয়ালের অভিনেতা গজেন্দ্র চৌহানের নিয়োগের সিদ্ধান্তের দিন থেকেই ছাত্ররা প্রতিবাদ করে চলেছে। কারণ এফটিআইআই-এর মতো মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হওয়ার কোনও যোগ্যতা তাঁর নেই। দীর্ঘ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সত্ত্বেও বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তার সিদ্ধান্ত বদল করেনি। এখন সরকার তার ইচ্ছাপূরণের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর বর্বরোচিত লাঠিচার্জ করছে। এই ভয়াবহ ঘটনা বিরোধী কণ্ঠস্বর ও গণতন্ত্রের প্রতি মোদি সরকারের তাচ্ছিল্যের মনোভাবের জ্বলন্ত নিদর্শন। এই ঘটনা আবার জানান দিল, কেন্দ্রীয় সরকার তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে কোনও পন্থা নিতে পারে, এমনকী বর্বরোচিত দমনপীড়নও চালাতে পারে। এই ঘটনা এ-কথাও প্রমাণ করল যে, তার নীতিকে কার্যকর করার জন্য সরকার তার সেবাদাসদের নিয়োগ করতে সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক রীতিকে পদদলিত করতে পারে। এ আই ডি এস ও মনে করে, অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে গজেন্দ্র চৌহানকে নিয়োগ করার দ্বারা ইনস্টিটিউট বা চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পের কোনও উন্নতিই হবে না। তাই এ আই ডি এস ও আন্দোলনরত ছাত্রদের প্রতি সংহতি জানাচ্ছে এবং গজেন্দ্র চৌহান ও ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডির চার সদস্যের পদত্যাগ দাবি করছে।

প্রশিক্ষণের ঘোষণা কার্যকরের দাবি উঠল রায়গঞ্জে গ্রামীণ চিকিৎসকদের কনভেনশনে

গ্রামীণ চিকিৎসকরা গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে সারা দেশে ৪০ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে থাকেন। সরকার এখনও গ্রামাঞ্চলে প্রশিক্ষিত ডাক্তার পর্যাপ্ত সংখ্যায় পাঠাতে পারেনি। তাই প্রয়োজন ছিল এঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে গ্রামের মানুষ আরও ভাল চিকিৎসার সুযোগ পান। গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন প্রোগ্রেসিভ মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েসন অফ ইন্ডিয়া সরকারি প্রশিক্ষণের দাবিতে দীর্ঘ দিন আন্দোলন করলেও এ রাজ্যের পূর্বতন সরকার দাবি মানেনি। বর্তমান সরকার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও আজও তা কার্যকর করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারও প্রশিক্ষণের বিষয়ে নীরব।

এই প্রেক্ষাপটে আন্দোলন তীব্রতর করতে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি চলছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ১৩ ডিসেম্বর রায়গঞ্জে গ্রামীণ ডাক্তারদের উত্তর দিনাজপুর জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ৯টি ব্লক থেকে ২০০ প্রতিনিধি অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, সহ সভাপতি ডাঃ রবিউল ইসলাম, জেলা সম্পাদক রাইসউদ্দিন আহমেদ, সভাপতি শান্তিলাল সিংহ, সার্ভিস ডক্টর ফোরামের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আহ্বায়ক ডাঃ গৌরাঙ্গ প্রামাণিক এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস। সংগঠনের দাবি শুধু প্রশিক্ষণ নয়, স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে সরকারি পরিকল্পনায় এঁদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে হবে। পৌর এলাকার নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদেরও সরকারি প্রশিক্ষণের দাবি জানিয়েছে সংগঠন। প্রসঙ্গত, এই সংগঠনের আন্দোলনের ফলে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহ সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের তৎপরতায় নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি লোকসভায় নথিভুক্ত হয়।

কুলতলিতে এ আই ডি এস ও-র আন্দোলনে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার

এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে কুলতলিতে কয়েকটি স্কুলে ফি বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। স্কুলে স্কুলে ছাত্র অভিভাবকদের সংগঠিত করে স্বাক্ষর সংগ্রহ, মাইক প্রচার, সভা, কনভেনশন ও ফি বৃদ্ধি বিরোধী ছাত্র অভিভাবক কমিটি গঠন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে ধাপে ধাপে উন্নীত করা হয়। ১ জানুয়ারি কাঁটামারি চূড়ামণি স্কুলে ভর্তি ফর্মের দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রধান শিক্ষক ভর্তি ফর্মের দাম ফেরত দিতে বাধ্য হন।

৪ জানুয়ারি বাইশহাটা অঞ্চলে যৌথিয়া বাউনি বিদ্যাপীঠে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির সময় কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফি নিতে গেলে ডি এস ও-র নেতৃত্বে ছাত্র বিক্ষোভ হয়। অভিভাবকরাও আন্দোলনে অংশ নেন। কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

৭ জানুয়ারি ভুবনেশ্বরী জয়কৃষ্ণ হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণির ভর্তি ফর্মের দাম ৫০ টাকা করার প্রতিবাদে অভিভাবকদের সংগঠিত করে ও ছাত্রদের নিয়ে গেটমিটিং ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। অবশেষে কর্তৃপক্ষ দাম কমাতে বাধ্য হয়। এদিনই নলগোড়া বৈকুণ্ঠধাম হাইস্কুলে সাইকেল দেওয়ার নামে কর্তৃপক্ষ ছাত্রপিছু ১০০ টাকা এবং স্কুলের ব্যাজ দেওয়ার নামে ২০ টাকা করে নেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কর্তৃপক্ষ সাইকেলের এবং ব্যাজের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়।

চেন্নাইয়ে ত্রাণ শিবির চলছে

চেন্নাইয়ের রামাপুরম এলাকায় ক্যাদুর্গত মানুষের মধ্যে এস ইউ সি আই (সি) এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে ২৮-২৯ ডিসেম্বর ত্রাণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এম আই ও টি হাসপাতালের পাশের এই এলাকাটি চেম্বারমবক্কম লেকের জলে প্লাবিত হয়েছিল। মারা গিয়েছিলেন হাসপাতালের আই সি ইউ বিভাগের বহু রোগীও। স্থানীয় নাগরিকরা বিশেষ করে যুবকরা এই ক্যাম্প পরিচালনায় সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। কয়েলপিল্লাই স্কুল কর্তৃপক্ষ মেডিকেল ক্যাম্পের জন্য স্কুল ব্যবহার করতে দেন। ২৮ ডিসেম্বর কেরালা থেকে আগত ডাঃ ভি বিষ্ণু, ডাঃ কে দেবানন্দন, ডাঃ এম অরুণ, ডাঃ অমৃত সুভাষ শিবির পরিচালনা করেন। তাঁদের সাহায্য করেন ভিল্লুপুরমের ৮ জন নার্সিং ছাত্র। কয়েকজন অভিজ্ঞ ফার্মেসি স্টাফ ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। ডাক্তাররা যাতে রোগীদের ভাষা বুঝতে পারেন

সেজন্য আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্র সহ মোট ছয় জন ছাত্র অনুবাদকের ভূমিকা পালন করেন। ডাক্তার, নার্স, ভলান্টিয়ার সহ শিবির পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়া, খাওয়ানো ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন স্থানীয় মানুষেরা। ২৯ ডিসেম্বর দুর্গত মানুষদের মধ্যে মাদুর, বেডসিট সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

২ ডিসেম্বরের এই ক্যায় কোঠান্দন নামে যে যুবক চোখের সামনে নিজের পরিবারের সবকিছু ভেসে যেতে দেখেও জীবন বিপন্ন করে ৭৬ জন মানুষকে উদ্ধার করে আশ্রয় শিবিরে পৌঁছে দিয়েছিলেন — তিনিও এই শিবিরে খুবই সাহায্য করেন। সহযোগিতা করেন স্থানীয় এক প্রাক্তন কাউন্সিলারও।

নদীয়ায় রক্তদান শিবির

এ আই ডি ওয়াই ও-র নাকাশিপাড়া থানার চিচুড়িয়া শাখার উদ্যোগে ১ জানুয়ারি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির উদ্বোধন

করেন স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক খাসবারি সেখ। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) নাকাশিপাড়া থানা কমিটির ইনচার্জ কমরেড কেষ্ট দেবনাথ, সংগঠনের চিচুড়িয়া ইউনিট সভাপতি আসাদুল সেখ, সহ সম্পাদক সইদুল মহলাদার, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মসিকুর রহমান।

বালুরঘাটে পরিচারিকার মিথ্যা অভিযোগ, মুক্ত করল পরিচারিকা সমিতি

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের ঘোষপাড়ায় এক আইনজীবীর বাড়িতে চুরির ঘটনায় মিথ্যা অভিযোগে ২ জানুয়ারি পুলিশ ঐ বাড়ির পরিচারিকা, তাঁর জামাই ও ভাইপোকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে থানায় আটকে রাখে। গোপালন কলোনির পরিচারিকারা সাথে সাথে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে ছুটে যান। সমিতির জেলা ইনচার্জ কমরেড কৃষ্ণা মহন্ত ও এস ইউ সি আই (সি) সংগঠক কমরেড নন্দা সাহা ও কমরেড বাবলী বসাকের নেতৃত্বে পরিচারিকারা থানায় ধর্না শুরু করেন। আই সি সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা নানা ভাবে চেষ্টা করতে থাকে পরিচারিকাদের থানা থেকে সরাতে। কিন্তু প্রায় একশো পরিচারিকা ধৃত বীণা সিং-এর মুক্তির দাবিতে অনড় থাকে। অবশেষে রাত আটটার সময় বীণা সিং সহ বাকি দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরিচারিকাদের উপর মিথ্যা অভিযোগ বন্ধ, তুচ্ছ কারণে অসম্মানজনক উক্তি, কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়া ইত্যাদির প্রতিবাদে এবং সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে পরের দিন প্রায় শ'তিনেক পরিচারিকার বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

তিনের পাতার পর

চরিত্রের— তারই বা কী ব্যাখ্যা দেব আমরা!" (পূর্বোক্ত)।

ড্যুরিং তীব্র ভাষায় হেগেলকে তাঁর প্রাপ্য তিরস্কার করেছেন, কিন্তু অচেতন জড়জগৎ থেকে চেতনাসম্পন্ন জীবজগতের উদ্ভব, অজৈব জগৎ থেকে জৈব জগতের উৎপত্তি যে আসলে এক স্তর থেকে লাফ দিয়ে অন্য একটি নতুন স্তরে উত্তরণ— হেগেলের এই সর্বজনবিদিত তত্ত্বটিকে ড্যুরিং বেমালুম চুপিসাড়ে আত্মসাৎ করেছেন। এহেন ড্যুরিংকে সমালোচনা করে এঙ্গেলস লিখেছেন— "পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারের ক্ষেত্রে এইটিই হল হেগেলীয় ক্রান্তিরেখা, এইখানেই এক একটি সুনির্দিষ্ট ক্রান্তিবিন্দুতে পৌঁছে নিছক পরিমাণগত সংযোজন অথবা বিয়োজন লাফ দিয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। যেমন জলের উদাহরণটিই ধরা যাক, জলের স্ফুটনাঙ্ক এবং হিমাঙ্কই এখানে ক্রান্তিবিন্দু। তাপ দিয়ে বা ঠান্ডা করে সেই বিন্দুতে পৌঁছলে, স্বাভাবিক চাপে, জল সামগ্রিকভাবে একটি নতুন অবস্থায় পৌঁছায়, যেক্ষেত্রে পরিমাণগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়" *(অ্যান্টি ড্যুরিং)*।

ঘ) মেটাফিজিক্সের বিপরীতে, দ্বন্দ্বতত্ত্ব যে মূল উপলব্ধির উপর গড়ে উঠেছে তা হল— প্রকৃতির সকল বস্তু ও ফেনোমেনার ভিতরে রয়েছে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কারণ সবকিছুর ভিতরেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক, পরস্পরবিরোধী দুটি দিক রয়েছে, রয়েছে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ; তার অভ্যন্তরে কিছুর বিনাশ ঘটছে, অন্য কিছুর বিকাশ ঘটছে। এই পরস্পরবিরোধী দিকগুলির দ্বন্দ্ব, পুরনো ও নতুনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মুমূর্ষু ও প্রাণচঞ্চল সদ্যোজাতের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিনাশশীল ও বিকাশশীলের দ্বন্দ্বের মধ্যেই রয়েছে বিকাশপ্রক্রিয়ার অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তনের পথে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের অন্তর্নিহিত সারবস্তু।

তাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে যে, নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে বিকাশের প্রক্রিয়া সংঘাতহীন ক্রমবিকাশ নয়, বরং ফেনোমেনার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিরোধের অভিব্যক্তি; এই সমস্ত বিরোধের উপর ভিত্তি করে যে বিপরীত ধারাগুলি সক্রিয় থাকে, সেগুলির "সংঘর্ষের"র ফল। লেনিন বলেছেন— "প্রকৃত প্রস্তাবে, বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যেই যে বিরোধ নিহিত রয়েছে, তাকে জানাই হচ্ছে দ্বন্দ্বতত্ত্ব" *(ফিলজফিক্যাল নোটবুকস)*। তিনি আরও বলেছেন— "বিপরীতের 'সংঘর্ষই' হল বিকাশ" *(অন দ্য কোয়েশ্চেন অব ডায়ালেকটিকস)*। সংক্ষেপে, এগুলিই হল মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য।

কাজেই সামাজিক জীবন ও সমাজের ইতিহাসকে খুঁটিয়ে বোঝার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির মূল নীতিগুলির প্রয়োগের যে কী বিরাট গুরুত্ব, তা সহজেই বোঝা যায়। এও বোঝা কঠিন নয় যে, সমাজের ইতিহাস ও সর্বহারা পার্টির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির প্রয়োগ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

তাহলে বিশ্বপ্রকৃতিতে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন কোনও ফেনোমেনার অস্তিত্ব যেহেতু নেই, সকল ফেনোমেনা যেহেতু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, একে অপরকে প্রভাবিত করে, তাই এও পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইতিহাসে কোনও সমাজব্যবস্থা, কোনও সামাজিক আন্দোলনকেই কোনও এক "শাশ্বত ন্যায়বিচার" বা ওই ধরনের পূর্বনির্ধারিত কোনও মাপকাঠিতে বিচার করা চলে না; যা বহু ঐতিহাসিকই করে থাকেন। বরং যে অবস্থা ওই সমাজব্যবস্থা বা সামাজিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, যার সঙ্গে ওই সমাজব্যবস্থা বা সামাজিক আন্দোলনটি যুক্ত, সেই পটভূমিতেই তার বিচার করতে হবে।

বর্তমান যুগের পটভূমিতে বিচার করলে, দাসপ্রথাকে অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা এবং অস্বাভাবিক বলেই মনে হবে। কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ভেঙে যাচ্ছিল, সেই অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মেই যে দাসপ্রথার উদ্ভব ঘটেছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের তুলনায় দাসপ্রথা ছিল অগ্রগতির পথে একটি পদক্ষেপ।

যেমন ধরা যাক, ১৯০৫ সালে রাশিয়ায়, যখন জারতন্ত্র ক্ষমতায় রয়েছে ও বুর্জোয়া ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সেই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি যে যুক্তিসঙ্গত, সঠিক ও বিপ্লবী দাবি তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ সেই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থ হল সামনের দিকে এক পা বাড়ানো। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন প্রতিষ্ঠিত, সেই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং প্রতিবিপ্লবী দাবি, কারণ সোভিয়েট রিপাবলিকের সঙ্গে তুলনায় বুর্জোয়া রিপাবলিক হল এক পা পিছু হাঁটা।

সবকিছুই স্থান, কাল এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

এও খুব পরিষ্কার যে, সামাজিক ঘটনাবলি সম্পর্কে এধরনের ইতিহাসসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে, ইতিহাস সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণার অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইতিহাসকে কতকগুলি বিশৃঙ্খল ঘটনার সমষ্টিতে এবং এক গুচ্ছ উৎকট ভ্রান্তিতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

তাছাড়া বিশ্বপ্রকৃতি অবিরাম গতি ও বিকাশের মধ্য দিয়েই যখন চলেছে, পুরাতনের বিনাশ ও নবীনের আবির্ভাবই যেহেতু বিকাশের নিয়ম, তাই কোনও সমাজব্যবস্থাই "অপরিবর্তনীয়" হতে পারে না; ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণের পিছনে কোনও "শাশ্বত নীতি', জমিদারের কাছে কৃষকের, পুঁজিপতির কাছে শ্রমিকের পদানত থাকার পিছনে কোনও "শাশ্বত ভাবধারা" থাকতে পারে না।

অর্থাৎ, একদিন যেমন বিকাশের যুগে পুঁজিবাদ সামন্তী সমাজের স্থান দখল করেছিল, তেমনি পুঁজিবাদী সমাজের জায়গায় আসবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

সুতরাং বর্তমান মুহূর্তে প্রধান সামাজিক শক্তি হিসাবে অবস্থান করলেও সমাজের যে অংশের আর বিকাশ ঘটছে না, তার স্বার্থ অনুযায়ী আমাদের নিজেদের গড়ে তোলা উচিতনয়, বরং বর্তমান মুহূর্তে প্রধান শক্তি হিসাবে অবস্থান না করলেও, সমাজের যে অংশটি বিকাশশীল এবং যার ভবিষ্যৎ রয়েছে তার স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়েই নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

বিগত শতাব্দীর আটের দশকে, নারদনিক*দের সঙ্গে মার্কসবাদীদের সংগ্রামের পর্যায়ে, রাশিয়ার জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল ছোটবড় চাষি, তুলনামূলকভাবে প্রলেতারিয়েতরা ছিল সংখ্যায় প্রায় নগণ্য। কিন্তু শ্রেণি হিসাবে প্রলেতারিয়েত ছিল বিকাশশীল, আর শ্রেণি অর্থে কৃষকদের ভাঙন শুরু হয়েছিল। যেহেতু প্রলেতারিয়েতরাই শ্রেণি হিসাবে বিকাশের পর্যায়ে ছিল, ঠিক সেই জন্যই মার্কসবাদীরা নিজেদের প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ অনুযায়ী গড়ে তুলেছিল। তারা ভুল করেনি; কারণ, আমরা জানি, পরবর্তীকালে এই সর্বহারা শ্রেণিই বিকাশের পথে নগণ্য শক্তি থেকে সবচেয়ে অগ্রণী ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

অর্থাৎ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি ভুল করতে না চাই তবে সামনের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে, পিছন দিকে নয়।

তা ছাড়া, ধীর পরিমাণগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে দ্রুত ও হঠাৎ গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ যেহেতু বিকাশের নিয়ম, তাই এও পরিষ্কার যে, যুগে যুগে শোষিত শ্রেণির বিপ্লবী অভ্যুত্থানও স্বাভাবিক এবং অনিবার্য।

এ-থেকে আরও যা বেরিয়ে আসে তা হল — পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, পুঁজিবাদী শোষণ-নির্যাতন থেকে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি অর্জন, ধীর পরিবর্তন বা সংস্কারের পথে হতে পারে না। পুঁজিবাদী সমাজের গুণগত পরিবর্তনের দ্বারা অর্থাৎ বিপ্লবের পথেই সমাজতন্ত্রে পৌঁছান সম্ভব। অর্থাৎ নীতিগত ক্ষেত্রে যদি ভুলের হাত থেকে বাঁচতে হয় তবে সংস্কারবাদী নয়, আমাদের বিপ্লবী হতে হবে।

আরও দেখা যাচ্ছে, যেহেতু বিকাশের ধারা হল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ, এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সেই দ্বন্দ্বের নিরসনের প্রক্রিয়াই হল বিকাশ; তাই প্রলেতারিয়েতের শ্রেণিসংগ্রামও পুরোপুরি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে আড়াল করা নয়, তাকে উদ্‌ঘাটিত করে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়াই আমাদের কাজ; শ্রেণিসংগ্রামকে প্রশমিত করা নয়, তাকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য।

অতএব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভ্রান্ত থাকতে হলে, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের সমন্বয়ের নীতি অর্থাৎ সংস্কারবাদী নীতি নিয়ে চললে হবে না, বিকাশের পথে পুঁজিবাদ 'আপন নিয়মেই' সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে— এরকম আপসমুখী নীতিকে বর্জন করতে হবে। আমাদের অবশ্যই আপসহীনভাবে সর্বহারা শ্রেণির রাজনীতি অনুসরণ করতে হবে।

এই হল সমাজজীবনে ও সমাজের ইতিহাসে মার্কসবাদী দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মূল কথা।

মার্কসবাদী দর্শন বা বস্তুবাদ মৌলিকভাবে ভাববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২) মার্কসবাদী দার্শনিক বস্তুবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এইরকম—

ক) মার্কসবাদের বিপরীতে ভাববাদ মনে করে বিশ্বপ্রকৃতি হল এক 'পরম ভাব' বা 'সর্বত্র বিরাজমান' 'আত্মা বা চেতনা'রই মূর্ত প্রকাশ। আর মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদের মূলকথা ঃ বিশ্বজগতের বৈশিষ্ট্যই হল তা বস্তুময়; তার বহুবিচিত্র প্রকাশ হল গতিশীল বস্তুরই নানা রূপ; দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফেনোমেনাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরশীলতা হল গতিশীল বস্তুর বিকাশেরই একটি নিয়ম; এবং বস্তুর গতির নিয়ম অনুযায়ীই এই বিশ্বজগতের বিকাশ ঘটছে, এর জন্য কোন 'সর্বভূতে বিরাজমান পরম চৈতন্যের' প্রয়োজন পড়ে না।

এঙ্গেলস বলেছেন— "বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি মানে হল— প্রকৃতি যেভাবে আছে, তাকে ঠিক সেভাবেই বোঝা, বস্তুবহির্ভূত কোনও ধারণা দিয়ে বোঝা নয়" *(ডায়ালেকটিকস অব নেচার)*।

প্রাচীনকালে গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেছিলেন — "সকল বস্তুর সমবায়ে গঠিত এই বিশ্বপ্রকৃতি কোনও ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, কোনও মানুষও একে গড়েনি, প্রকৃতি জগৎ চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে। এ যেন একটা অগ্নিশিখা যা স্বাভাবিক নিয়মেই কখনও নেভে আবার নিয়ম মেনেই জ্বলে ওঠে"। তাঁর এই বস্তুবাদী বক্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন— "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আদি ও অপরিস্ফুট রূপের এ এক চমৎকার নিদর্শন" *(ফিলজফিক্যাল নোটবুকস)*।

খ) ভাববাদ বলে যে, কেবলমাত্র আমাদের চেতনা হল বাস্তব; বস্তুজগৎ, বস্তুসত্তার অস্তিত্ব, প্রকৃতির অস্তিত্ব সবকিছুই আমাদের চৈতন্যের উপর, আমাদের অনুভূতি, ভাবনা ও উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। ভাববাদের বিপরীতে মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শন বলে পদার্থ, প্রকৃতি, বস্তুসত্তা হল চেতনানিরপেক্ষ বাস্তব, আমাদের চৈতন্যের বাইরে এর স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে। মার্কসীয় বস্তুবাদে বলা হয়, বস্তুই আদি ও মূল, কারণ তা হল অনুভূতি, ভাবনা ও চৈতন্যের উৎস; এ-সবই বস্তুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। চেতনা হল গৌণ, এর সৃষ্টি বস্তু থেকে, কারণ চেতনা বস্তুরই প্রতিফলন; বাস্তব ও চেতনানিরপেক্ষ বস্তুজগতেরই প্রতিফলন। চিন্তার উৎপত্তিও বস্তু থেকে, যে বস্তু বিকাশের পথে মানুষের মস্তিষ্কের মতো এক অত্যন্ত উন্নত নিখুঁত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং এই মস্তিষ্ক হল চিন্তা করার অঙ্গ। তাই চিন্তাকে বস্তু থেকে পৃথক করা চলে না, করলে তা হবে মারাত্মক ভুল। এঙ্গেলস বলেছেন—

"চিন্তার সঙ্গে বস্তুসত্তার, চৈতন্যের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কী? এইটিই হল দর্শনের মূল প্রশ্ন। ...এই প্রশ্নের উত্তর কে কীভাবে দিয়েছেন তার ভিত্তিতে দার্শনিকদের দুটি প্রধান শিবিরে ভাগ করা হয়। যাঁরা মনে করেন বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভবেরও আগে চৈতন্যের অস্তিত্ব ছিল ... তাঁরা হলেন ভাববাদী। আর যাঁরা বস্তুজগতকেই সবকিছুর ভিত্তি, বস্তুকেই আদি বলে মনে করেন, চিন্তাধারার নানা পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই বস্তুবাদী" *(লুডউইগ ফুয়েরবাখ অ্যান্ড দি এন্ড অফ ক্ল্যাসিকাল জার্মান ফিলজফি)*।

তিনি আরও বলেছেন— "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই যে বস্তুজগতের মধ্যে আমরা রয়েছি, এইটিই একমাত্র বাস্তব। ...আমাদের চৈতন্য ও চিন্তাক্ষমতাকে যতই ইন্দ্রিয়াতীত বলে মনে হোক না কেন, তা বস্তু দিয়ে গঠিত আমাদের দেহেরই একটি অঙ্গ, মস্তিষ্কের সৃষ্টি। ভাব থেকে বস্তু সৃষ্টি হয়নি, বরং ভাব হল বস্তুর সর্বোন্নত সৃষ্টি।"

বস্তু ও চিন্তা সম্পর্কে কার্ল মার্কস বলেছেন— "বস্তুই চিন্তা করে। তাই বস্তু থেকে চিন্তাকে আলাদা করা যায় না। সকল পরিবর্তনের মূলে আছে বস্তু" *(সোস্যালিজম ঃ ইউটোপিয়ান অ্যান্ড সায়েন্টিফিক)*।

বস্তুবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে লেনিন বলেছেন— "বস্তুবাদ সমস্ত দিক থেকেই বাস্তব সত্তা, অর্থাৎ বস্তুর অনুভূতি, অভিজ্ঞতা আর চেতনানিরপেক্ষ অবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়। ...চেতনা হল বস্তুরই প্রতিফলন, খুব নিখুঁত হলে, তা বস্তুর মোটামুটি নির্ভরযোগ্য (যথাযথ ও সম্পূর্ণ সঠিক) প্রতিফলন" *(মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম)*।

লেনিন আরও বলেছেন— "আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির উপর ক্রিয়া

সাতের পাতায় দেখুন

---

* নারদনিক — এরা মনে করত, জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই, তাদের নিজেদের চেষ্টায়, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করতে পারবে। উনিশ শতকের শেষ দশকে এরা মার্কসবাদের বিরোধিতা করত।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম তলানিতে
দেশের মানুষকে তার সুবিধা পেতে দিচ্ছে না সরকার

২ জানুয়ারি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ডিজেল-পেট্রলের উপর আবার শুল্ক চাপাল। সাথে সাথে ঘোষণা করেছে এই বর্ধিত শুল্ক ক্রেতাদের খুচরো দামের সাথে যুক্ত হচ্ছে না। অর্থাৎ এই শুল্ক বৃদ্ধির কারণে ক্রেতাদের জন্য পেট্রল-ডিজেলে দামের হেরফের হবে না। তা হলে বাড়তি শুল্ক দিচ্ছে কারা? তেল কোম্পানিগুলি? এই নিয়ে বিজেপি সরকার ১৪ মাসে ৭ বার শুল্ক বৃদ্ধি করল। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যত কমেছে, সে অনুপাতে ভারতের খুচরো বাজারে দাম কমানো হয়নি, কিন্তু সরকারি ট্যাক্স বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে অনেক। অর্থাৎ সরকারি কোষাগার ভরানো হয়েছে। কেন? কার প্রয়োজনে? দেশবাসীর সাথে এ তো এক ভয়ঙ্কর প্রতারণা!

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার সুযোগে সরকার দু'ভাবে টাকা মজুত করছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে এক ডলার কমলে ভারতের তেল আমদানির খরচ ৬ হাজার ৫শো কোটি টাকা কমে যায় (এশিয়ান এজ, ১.১.২০১৬)। বিজেপি শাসনেই তেলের দাম ১১৫ ডলার থেকে কমে ৩০ ডলার হয়েছে। ফলে আমদানি ব্যয়ে সাশ্রয় হয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। দ্বিতীয়ত, এমনিতেই আমাদের দেশের পেট্রল-ডিজেলের যা বিক্রয়মূল্য, বহুবার দেখানো হয়েছে তার ৫০ শতাংশেরও বেশি হচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা ধরনের কর ও সেস। এরপরও নতুন করে কর বসিয়ে টাকা তোলা চলছেই।

২০১৪ সালের মে মাসে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় বসার পর ওই বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল পিছু ১১৫ ডলার। তৎকালীন ১ ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল ৫৮ টাকা ৪৪ পয়সা। এই হিসাবে এক ব্যারেল অর্থাৎ ১৫৯ লিটার তেলের দাম বিশ্ববাজারে ছিল ৬৭২০ টাকা ৬০ পয়সা। এই হিসাবে ১ লিটারের দাম হওয়ার কথা ৪২ টাকা ২৬ পয়সা। ওই সময়ে খুচরো দর নির্ধারণ করা হয়েছিল পেট্রলে লিটার পিছু ৭৪ টাকা ৪২ পয়সা এবং ডিজেলের ৫৫ টাকা ৪৫ পয়সা। এই যে পেট্রলের ক্ষেত্রে বাড়তি ২৯ টাকা ৪২ পয়সা (৭৪ টাকা ৪২ পয়সা - ৪২টাকা ২৬ পয়সা) এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে (৫৫ টাকা ৪৫ পয়সা - ৪২টাকা ২৬ পয়সা) ১০ টাকা ৯৭ পয়সা বাড়তি নেওয়া হল, ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক যে, ওই পরিমাণ বাড়তির একটি অংশ দেশের মধ্যে তেল শোধন, সরবরাহ প্রভৃতির জন্য দরকার হয়েছে, বাকি অংশটা সরকারি কর-সেস বাবদ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই হিসাব মিলছে না ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের তেলের মূল্য বিচার করে। ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম মাত্র ৩৭ ডলারে অর্থাৎ ২৪৪০ টাকায় (১ ডলারের দাম ৬৫ টাকা ৯৪ পয়সা)নেমে এসেছে। অর্থাৎ এক লিটার অপরিশোধিত তেলের দাম দাঁড়ায় ১৫ টাকা ৩৬ পয়সা। ২০১৪ সালের জুন মাসের দামের অনুপাতে শোধন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ এবং সরকারি করের হার কিছুমাত্র না কমিয়ে যোগ করলে স্বাভাবিক নিয়মেই এখন পেট্রলের দাম হওয়ার কথা লিটার পিছু ৪৫ টাকা ৩০ পয়সা এবং ডিজেলের দাম লিটার পিছু ২৬ টাকা ৩৩ পয়সা। কিন্তু বর্তমানে মানুষকে লিটার পিছু ৬৫ টাকা ৫ পয়সায় পেট্রল এবং ৪৮ টাকা ৮১ পয়সায় ডিজেল কিনতে হচ্ছে। অর্থাৎ ১৯ টাকা ৭৫ পয়সা বেশি দামে পেট্রল এবং ২২ টাকা ৪৮ পয়সা বেশি দামে ডিজেল কিনতে হচ্ছে। ('মাই কার হেল্পলাইন ডট কম'-এর দেওয়া তথ্য অনুসরণে) এই বাড়তি টাকাটা নিচ্ছে কে? অবশ্যই সরকার এবং সেটা অঘোষিত শুল্ক হিসাবেই। এই সরকার যদি জনমুখী হত, তাহলে তারা তেলের দাম কমিয়ে পরিবহণ ব্যয়কে যতদূর সম্ভব কম রাখতেই সচেষ্ট হত। সকলেরই জানা, তেল ছাড়া পরিবহণ অচল। পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি জনগণের জীবনযাত্রায় বাড়তি সংকট ডেকে আনে। কোনও প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার সে কাজ অর্থাৎ তেলের দাম বাড়ানোর মতো জনবিরোধী কাজ করতে পারে না। অথচ মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার সেই কাজটিই করেছে। রেলের যাত্রী ও মাশুল ভাড়া, প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম তো দফায় দফায় বাড়িয়েছে এই সরকার। তার সাথে তেলের দাম। নির্বাচনে জিতে প্রথম যেদিন নরেন্দ্র মোদি বহুকথিত গণতন্ত্রের পীঠস্থান পার্লামেন্টে যান, সেদিন পার্লামেন্টের দরজায় প্রণাম করে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, সে ভক্তি যে জনগণের গণতন্ত্রের প্রতি ছিল না, তা আজ দেশের গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। যে জনগণের ভোটে তারা জিতেছে, সেই জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকলে নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপির সরকার তেল নিয়ে জনগণকে এমনভাবে প্রতারিত করতে পারত না।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের সুযোগ নিতে ট্যাক্সের হার বাড়িয়ে দিয়েছে। তেল থেকে সাশ্রয়কৃত ও সংগৃহীত বিপুল অর্থ জনগণের কল্যাণে লাগবে— এমন আশা দুরাশা মাত্র। কারণ এই সরকার প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়েছে। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিয়েছে, স্বাস্থ্য খাতে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে, শিশু শিক্ষায় বরাদ্দ কমিয়েছে। 'ট্যাক্স বাড়লেই জনগণের উপকারে লাগবে' এ ভাবনা একেবারে ভিত্তিহীন। জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো থেকে বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। সার, গণবণ্টন, রান্নার গ্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভরতুকি কমাচ্ছে। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, দেশ থেকে ভরতুকির ব্যাপারটাই উঠে যাচ্ছে। ভরতুকি থাকছে, ভিন্ন পদ্ধতিতে পুঁজিপতিদের জন্য। রপ্তানি বাড়াবার জন্য মালিকদের ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে বিপুল পরিমাণ। মালিকদের যে হাজার হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হচ্ছে, তা তো ভরতুকিই। ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ যখন মালিকরা পরিশোধ করে না, তখন অনাদায়ী সেই টাকা নন-পারফর্মিং অ্যাসেট-এর নামে আদায় স্থগিত করা হচ্ছে। এ সবই তো জনগণের ট্যাক্সের টাকায় মালিকদের উপঢৌকন। এই নীতিই নিয়ে চলছে পুঁজিপতিদের টাকায় পুষ্ট দল বিজেপি। তাদের কার্যকলাপই বুঝিয়ে দিচ্ছে তারা কাদের স্বার্থ রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর। এদের রাজনৈতিক চরিত্র চিনে নিয়ে জনগণকে নিজেদের করণীয় স্থির করতে হবে।

কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে রেকর্ড ব্যুরোর রেকর্ড কারচুপি

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো ২০১৪ সালে দেশে কৃষক আত্মহত্যার তথ্য সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কৃষক আত্মহত্যায় মহারাষ্ট্র সব থেকে এগিয়ে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়। আত্মহত্যা নিয়ে এই ধরনের রিপোর্ট দেশের মানুষের অজানা নয়। কিন্তু এই রিপোর্টের বিশেষত্ব হল রেকর্ড ব্যুরো অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে কৃষক আত্মহত্যা কম করে দেখানোর চেষ্টা করেছে।

ব্যুরোর তথ্যানুসারে ২০১৩ সালে মহারাষ্ট্রে ৩,১৪৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। ২০১৪ সালে করেছে ২,৫৬৮ জন। অর্থাৎ কৃষক আত্মহত্যা ২০১৩-র তুলনায় ২০১৪-তে ৫৭৮ জন কম।

কোন জাদুতে কৃষক আত্মহত্যা কমে গেল? যে যে কারণে কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় সেই কারণগুলি কি সরকার দূর করেছে? কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে? ফসলের উৎপাদন খরচ কম রাখতে সার-বীজ-কীটনাশক সহ ডিজেল-বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় ভরতুকি দিয়েছে? কৃষকদের ঋণ মকুব করেছে? মহাজনী সুদের চক্র থেকে কৃষককে বাঁচানোর কোনও উদ্যোগ নিয়েছে? মিডলম্যান বা ফড়ে চক্রের হাত থেকে রক্ষা করতে সরকারি উদ্যোগে বিকল্প ক্রয়কেন্দ্র সম্প্রসারিত এবং সক্রিয় করেছে? এগুলির কোনও কিছুই করেনি। কৃষকদের প্রতি কোনও দায়িত্বই সরকার পালন করেনি। বরং কেন্দ্রের মোদি সরকার এর বিপরীত পথেই হেঁটেছে। কৃষি বাজেট কমিয়েছে। তা হলে কৃষক আত্মহত্যা কমে গেল কী করে?

এখানেই রয়েছে রেকর্ড ব্যুরোর রেকর্ড কারচুপি। এজন্য স্রেফ বিয়োগ অঙ্কের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কৃষি সংশ্লিষ্ট যে মোট আত্মহত্যা তা থেকে খেতমজুরের সংখ্যাটা বাদ দেওয়া হয়েছে। কত ছিল কৃষি সংশ্লিষ্ট মোট আত্মহত্যা? রিপোর্ট বলছে ২০১৪ সালে সংখ্যাটা ছিল ৪,০০৪ জন। এর মধ্যে খেতমজুরের সংখ্যা ১,৪৭২ জন। এটা বাদ দেওয়াতেই কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা কমে যায়।

কৃষক আত্মহত্যার ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান রূপে দেখানোর দুরভিসন্ধি রেকর্ড ব্যুরোর ম্যানেজারদের মাথায় ঢুকলো কী করে? আসলে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো একটি সরকারি সংস্থা। সরকার যা চায় সেভাবে সে তথ্য সাজায়। ফলে এই রিপোর্টে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছে।

কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি কী? কৃষক আত্মহত্যাই হোক বা শ্রমিক আত্মহত্যা — প্রথমত কোনও সরকারই তা স্বীকারই করতে চায় না। যেমন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বা তার কৃষিদপ্তর স্বীকারই করে না যে এ রাজ্যে কোনও কৃষক আত্মহত্যা করেছে। পূর্বতন সিপিএম সরকারও করেনি। উভয় সরকারই এ রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যাকে পারিবারিক অশান্তি, প্রণয়ঘটিত মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাতের ফল হিসাবে দেখিয়েছে। যেমন সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে মাসের পর মাস বন্ধ চা-বাগানে বেতনহীন-চিকিৎসাহীন চা-শ্রমিকদের অনাহারে-অর্ধাহারে-ক্রনিক অপুষ্টিতে মৃত্যুর কারণকে মদ খেয়ে মৃত্যু বলে সরকার পক্ষ বিবৃতি দিয়েছে। তেমনি বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়ের কৃষি মন্ত্রী ব্রিজমোহন আগরওয়াল বলেছেন, ছত্তিশগড়ে কোনও কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেনি। তাঁর প্রশ্ন, ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো কোত্থেকে এ সব আত্মহত্যার তথ্য পায়? এই সব তথ্যের কী বিশ্বাসযোগ্যতা আছে? এরপর তাঁর উক্তি, 'আমার যতদূর জানা তাতে রাজ্যে কোনও কৃষক আত্মহত্যা করেনি'। কিন্তু কে প্রশ্ন করবে তাঁকে যে, তাঁর জানাটাই তো সত্যের মাপকাঠি নয়। আসলে এসব সরকারি বয়ান। শাসন ক্ষমতায় বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম, বিজেডি, টি আর এস, এন সি পি ইত্যাদি জাতীয় বা আঞ্চলিক, বুর্জোয়া বা বাম সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল যেই থাকুক, সকলে এক ভাষাতেই কথা বলে, এক সুরে গায় গান।

কেন এমন হয়? এর প্রথম কারণ এরা প্রত্যেকেই দেখাতে চায় তারা কৃষকদরদী। তাদের শাসনে কৃষকদের সংকটের সমাধান হয়ে গেছে। আর এই দাবির সূচক হল আত্মহত্যা কমেছে বা একেবারেই নেই। দ্বিতীয় কারণ হল, আত্মহত্যার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী শাসন তা জনগণকে বুঝতে না দেওয়া। এই মতলব থেকেই আত্মহত্যা চেপে দেওয়ার চূড়ান্ত নির্লজ্জ সরকারি আয়োজন।

তবে ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর এই কারচুপি একটি সত্যকেও তথ্যে তুলে ধরেছে। তা হল, কৃষিমজুরের আত্মহত্যা। ভারতে শুধু সম্পন্ন চাষি বিপুল ঋণের ফাঁদে পড়ে আত্মহত্যা করছে তা নয়, কৃষিতে সারা বছর কাজ না পাওয়ায়, ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প যথাযথ রূপায়ণ না করায়, বা মোদি সরকারের হাত ধরে এই প্রকল্পের অন্তর্জলিযাত্রা ঘটায় এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির ফলে বেঁচে থাকার উপকরণ জোগাতে ব্যর্থ হয়ে তারা মৃত্যুতেই মুক্তির পথ খুঁজছে।

খেতমজুরের আত্মহত্যা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প রূপায়ণ নিয়েও। সারা দেশ জুড়ে খেতমজুর আত্মহত্যা বা চা-বাগানে অনাহারি শ্রমিকের আত্মহত্যা দেখাচ্ছে, সরকার যতই খাদ্য সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিই দিক, তাদের জীবনে কোনও খাদ্য নিরাপত্তাই নেই।

যে শাসনব্যবস্থা তার নাগরিকদের নূন্যতম খাদ্যের নিরাপত্তা দিতে পারে না, তেমন ব্যবস্থা থেকে কী লাভ?

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

ছয়ের পাতার পর

করে যা অনুভূতির সৃষ্টি করে, তা-ই বস্তু। বস্তু হল একটি বিদ্যমান বাস্তব, যাকে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। বস্তু, বিশ্বপ্রকৃতি, জৈব ও অজৈব পদার্থের অস্তিত্বই হল আদি, মুখ্য এবং অনুভূতি, চৈতন্য, মানসিকতা— এসবই গৌণ, বস্তু থেকেই তা গড়ে উঠেছে।" *(পূর্বোক্ত)*।

"যেভাবে বস্তু গতির মধ্য দিয়ে চলেছে, *যেভাবে বস্তু চিন্তা করছে*— তাই বিশ্বপ্রকৃতির প্রকৃত রূপ।" (পূর্বোক্ত) "মস্তিষ্কই হল সেই অঙ্গ যা দিয়ে আমরা চিন্তা করি।" *(পূর্বোক্ত)*।

গ) ভাববাদ মনে করে বিশ্বপ্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে জানা সম্ভব নয়। আমাদের জ্ঞান যে সঠিক হতে পারে এ-বিশ্বাস তার নেই, চেতনানিরপেক্ষ বাস্তব সত্যকে সে স্বীকার করে না। ভাববাদ মনে করে সমস্ত বস্তুজগৎ এমন কিছু অজ্ঞেয় সত্তায় (things-in-themselves) পূর্ণ যাকে বিজ্ঞান কোনও দিনই জানতে পারবে না, জানা সম্ভবই নয়। এর বিপরীতে, মার্কসীয় দার্শনিক বস্তুবাদের গোড়ার কথা হল বিশ্বপ্রকৃতি ও তার নিয়মকানুনগুলিকে জানা পুরোপুরি সম্ভব। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকানুন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, যা অভিজ্ঞতা ও হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যায়, তা নির্ভরযোগ্য, বাস্তব সত্য। জগতে অজ্ঞেয় বলে কিছু নেই, তবে অজানা অনেক কিছু আছে, যা ভবিষ্যতে আমরা বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উদঘাটিত ও আয়ত্ত করতে পারব। (ক্রমশ)

(রচনাকাল ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

কুলতলির অসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের জয়

৭ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি ব্লকের অসংগঠিত শ্রমিকদের এক বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। প্রায় সাড়ে চার হাজার অসংগঠিত শ্রমিক ব্লকের ৯টি অঞ্চল থেকে যোগদান করেন। নির্মাণ শ্রমিক, মোটরভ্যান চালক, মৎস্যজীবী, বিড়ি শ্রমিক সহ সমস্ত স্তরের অসংগঠিত শ্রমিকরা প্রবল উদ্দীপনা সহ এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। দাবি ছিল, ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট ২০০৬ অনুসারে মৎস্যজীবীদের দলিল প্রদান, জলদস্যুদের অত্যাচার বন্ধ করা, বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি,

আইডেন্টিটি কার্ড, সরকারি কল্যাণ প্রকল্প চালু করা, নির্মাণ শ্রমিকদের কার্ড, মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স প্রদান ও রাস্তা মেরামত প্রভৃতি। তাঁরা বিডিও, লেবার ইন্সপেক্টর, ফিসারি অফিসারের কাছে ডেপুটেশন দেন। বিক্ষোভের চাপে প্রশাসন শ্রমিকদের বেশ কিছু দাবি মেনে নেয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমরেড সওকত সর্দার, বক্তা হিসাবে ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শংকর ঘোষ, প্রাক্তন বিধায়ক এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতা কমরেড শাহজাহান শেখ, জেলা এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতা কমরেড অমল সাউ, কমরেড হাবু কয়াল ও কমরেড জৈমিনী বর্মন।

আসামে নারী নির্যাতন বিরোধী কনভেনশন

৩ জানুয়ারি আসামের কামরূপ জেলার বাইহাটা চারিআলিতে এ আই এম এস এস -এর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, নারী ও শিশু পাচার, মদ-জুয়া-লটারির বিরুদ্ধে গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভার আগে শতাধিক মহিলা বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল করে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সভাগৃহে সমবেত হন। কমরেড পাহেশ্বরী বড়ুয়ার সভাপতিত্বে এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সভানেত্রী ডাঃ চিত্রলেখা দাস এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড স্বর্ণলতা চলিহা। বক্তারা উপরোক্ত সমস্যা প্রতিরোধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে নারী-পুরুষ সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই গণ কনভেনশনে সংগঠনের বাইহাটা আঞ্চলিক কমিটি নতুন রূপে গঠন করা হয়।

এ আই ডি এস ও-র আন্দোলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি কনসেশন চালু

এ আই ডি এস ও-র আন্দোলনের চাপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি কনসেশন চালু হল। সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড চন্দন সাঁতরা বলেন, ২০১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এম এ, এম কম ও এম এস সি-র ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি কনশেসন বন্ধ করে দেয়। ডি এস ও-র পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে অবহেলা করে। ফলে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এই অবস্থায় ডি এস ও ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করে ৩০ ডিসেম্বর উপাচার্যের সাথে দেখা করে অবিলম্বে টিউশন ফি কনশেসন চালুর দাবি জানায়। আন্দোলনের চাপে অবশেষে কর্তৃপক্ষ টিউশন ফি কনশেসন পুনরায় চালু করতে বাধ্য হয়।

বেহালায় শিশু-কিশোরদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কলকাতায় পশ্চিম বেহালার বেগোর খাল এলাকার স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে ৩ জানুয়ারি শিশু-কিশোরদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কবাডি, পিটি, অভিনয়, খুশিমতো সাজো ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উদ্যোক্তা যুবকরা নিয়মিত এই ধরনের অনুষ্ঠান, মনীষী চর্চা প্রভৃতির মাধ্যমে এলাকায় সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিভাবকদের উৎসাহও লক্ষণীয়।

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র
সর্বভারতীয় ক্যাম্প

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র সর্বভারতীয় কমিটির উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি ঘাটশিলার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে সর্বভারতীয় ক্যাম্প ও বর্ধিত কাউন্সিলের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ টি রাজ্য থেকে মোট ৪৪৮ জন প্রতিনিধি এই ক্যাম্পে অংশ নেন। প্রতিনিধিদের সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের দুটি বই 'সংস্কৃতির সংকট ও ফ্যাসিবাদ' এবং 'গান্ধিবাদ — এক আলোচনাত্মক অধ্যয়ন' ছাড়াও ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত তাঁর বিভিন্ন আলোচনা এবং মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বইটি পড়ে আসতে বলা হয়েছিল।

চারদিনের এই ক্যাম্পের প্রথম দু'দিন শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনায় প্রতিনিধিরা এবং সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। একটি অধিবেশনে 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা — অতিরঞ্জন ও বাস্তব' এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী। শেষের তিনটি অধিবেশনে প্রতিনিধিদের উত্থাপিত ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ মূল্যবান আলোচনা করেন। এ ছাড়াও 'পথের দাবী' প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেন। চারদিনের এই কর্মসূচি প্রত্যেকের মধ্যেই গভীর উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। শিক্ষার উপর সর্বাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধে সর্বভারতীয় কমিটি ঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচি সফল করার সংকল্প নিয়ে ছাত্র সংগঠকরা নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যান।

৯ জানুয়ারি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বেলে-দুর্গানগর অঞ্চলের মাঠে কমরেড রাজারাম রায়মণ্ডলের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। চোখের জলে প্রয়াত নেতাকে স্মরণ করেন বক্তারা। বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org